Available online at http://www.ijims.com

ISSN: 2348 – 0343

An in depth study of a song of Tagore : *jharā pātā go āmi tomāri dale*

ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে : অন্তরঙ্গ পাঠ

Goutam Kumar Nag

Dept. of Foreign Languages

University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : *jharā pātā go āmi tomāri dale.* It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song ; the musical aspect is excluded. This song belongs to the subsection *basanta* (spring) of the section *prakṛti* (nature). However in this song we do not find the usual imageries that are associated with spring. Here the poet focalizes his attention on the dry fallen leaves which occupy a marginal position in literature.. Tagore unveils the inner beauty of the fallen leaves which have no place in the universe of external beauty. Through an in depth study of the salient linguistic features of the song we have tried to demonstrate how this theme has been developed at various levels : lexical, morpho-syntactic and semantic levels.

Key Words : spring, beauty, Tagore's song, linguistic features

Article

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের বসন্ত উপপর্যায়ের একটি সুপরিচিত গানের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে (প্রকৃতি / গানসংখ্যা ২৮৮)। সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, গানের কাব্যরূপটি আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা এর বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব : শব্দচয়ন, পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বাক্যের গঠনকৌশল, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার।

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়াতলে॥
ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ।
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন-রঙে দিয়ো রঙিন করি---
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥[১]

বসন্তের গানের মধ্যে এই গানটি একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। বসন্তের চিরাচরিত রূপকল্পগুলি এই গানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আমরা জানি রবীন্দ্রভাবনাবিশ্বে বসন্ত শুধুই ফোটা ফুলের মেলা নয় ; তার সঙ্গে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে যা চরম অবহেলার, অনাদরের সেই ঝরা ফুল, ঝরা পাতার উপরও তাঁর মরমী দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুন্দর-অসুন্দর, মহৎ-তুচ্ছ, ভূমা-ক্ষুদ্র --- সব বিপ্রতীপের সহাবস্থানেই তাঁর নান্দনিক সৃষ্টির বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এই গানে সেই সহাবস্থান নেই। এখানে কবির ভাবনা সম্পূর্ণভাবে ঝরা পাতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে ; সে দৃশ্যপটের বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে। যে পরিসর উপেক্ষিত দীনহীন এই ঝরাপাতার

জন্য এই গানে নির্দিষ্ট হয়েছে তার তুলনা বিরল ; সেইসঙ্গে ঝরা পাতাকে ঘিরে উৎসারিত অনুভূতির কারণেও গানটি অনন্য।

প্রথমে আমরা দেখে নেব রবীন্দ্রনাথের গানে সাধারণভাবে ঝরা পাতার স্থান কোথায়। প্রথমে আমরা আমাদের আলোচ্য গানে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গানগুলিতে ঝরা পাতার জন্য নির্দিষ্ট পরিধি নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করব। "ঝরা পাতা" শব্দবন্ধটি আর অন্য কোন গানে পাওয়া যায় না। আমাদের আলোচনার জন্য দেখতে হবে সমার্থক বা অনুরূপ অনুষঙ্গবাহী শব্দবন্ধের ব্যবহার আর কোন কোন গানে হয়েছে --- যেমন "শুকনো পাতা" "জীর্ণ পাতা"। সেইসঙ্গে আমরা দেখব সেইসব গান যেখানে সুস্পষ্টভাবে পূর্বোক্ত শব্দবন্ধগুলি ব্যবহার না হলেও অনুরূপ দৃশ্যকল্প রয়েছে। আমাদের আলোচ্য গানে ছটি বাক্যের মধ্যে চারটি বাক্যেই ঝরা পাতার উপস্থিতি। "শুকনো পাতা"র উপস্থিতি রয়েছে এমন গানের সংখ্যা দশ।[২] "জীর্ণ পাতা" দেখা যায় চারটি গানে।[৩] এছাড়া পাতা ঝরার রূপকল্প দেখা যায় ছটি গানে।[৪] এই সমস্ত গানে একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সবক্ষেত্রে দেখা যায় শুকনো বা জীর্ণ পাতার জন্য বা পাতা ঝরার বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট শুধুমাত্র একটি বাক্য। ব্যতিক্রম প্রকৃতি পর্যায়ের ২৬৪ নং গানটি : ফাগুনের শুরু হতে শুকনো পাতা ঝরল যত। এই গানটিতে শুকনো পাতার জন্য নির্দিষ্ট পরিসর আমাদের আলোচ্য গানের চেয়েও বিস্তৃত ; এই গানে প্রতিটি বাক্যেরই কর্তা "শুকনো পাতা"। এই গানটির প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে, প্রাথমিক পাঠ থেকেই বলা যায় আমাদের আলোচ্য গানে ঝরা পাতা এক অপ্রত্যাশিত গুরুত্ব লাভ করেছে। এরপর একইভাবে শুধুমাত্র প্রাথমিক পাঠেই এই গানে ঝরা পাতাকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। সর্বনামের ব্যবহারকে এইক্ষেত্রে মানদণ্ড ধরা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য গানটি বাদ দিলে আর কোন গানেই ঝরা পাতার জন্য সর্বনামের মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ দেখা যায় না। অন্য কোন গানে ঝরা পাতার প্রতি কোন সম্ভাষণবাণী উচ্চারিত হয় না, কবিপ্রাণের সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দেখা যায় না। অন্যদিকে আমাদের গানের শুরুই হচ্ছে অন্তরঙ্গ সম্ভাষণের মধ্য দিয়ে। শুধু মধ্যম পুরুষ নয় তারও আগে "গো" অব্যয়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই এই সম্পর্কের নৈকট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর একই কলিতে উত্তম ও মধ্যমপুরুষের সহাবস্থান, পরবর্তী অংশে চতুর্থ কলিতে "গো" অব্যয়ের পুনরাবৃত্তি, অষ্টম কলিতে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের পুনরাবৃত্ত সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে সেই সম্বন্ধ গভীরতর রূপে দেখা দেয়। প্রাথমিক পাঠের উপর ভিত্তি করেই বলা চলে ঝরা পাতার সঙ্গে কবিহৃদয়ের সম্বন্ধটি এই গানে নিবিড়তম।

ঝরা পাতার ভূমিকা অনুসারে আমাদের আলোচ্য গানটি বাদে অন্যান্য গানগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণির গানে দেখা যায় ঝরা পাতার স্থান শুধু পটভূমিতে। তার উপস্থিতি কোন গভীর অনুভূতির উদ্রেক করে না। এই শ্রেণির গানের দৃষ্টান্ত :

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে উদাস-করা কোন্ সুরে।।[৫]
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী---
.....
জল উঠেছে ছলছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়া ঝরে পাতা বিজন তরুতলে।[৬]

আর এক শ্রেণির গানে দেখা যায় ঝরা পাতার বিদায়ের মুহূর্তে জাগে গভীর হাহাকার

কেন আমায় পাগল করে যাস ওরে চলে-যাওয়ার দল।
.....
শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আমলকী-বন মরণ-পাতা, [৭]

সবশেষে কিছু গানে ঝরা পাতার উপস্থিতি জীর্ণ পুরাতনের প্রতীক রূপে। পুরাতনের বিদায়ের মধ্য দিয়েই নূতনের আবির্ভাব সূচিত হয়। জীর্ণ পত্ররাজির মধ্যে থাকে নবপত্রোদ্গমের আশ্বাসবাণী। বিদায়ক্ষণের বিষাদবিধুর অনুভবকে ছাপিয়ে যায় নবীনকে আবাহনের আনন্দ। এই বিদায় ও আগমনের মধ্য দিয়ে চিরপ্রবহমান থাকে অনন্ত সৃষ্টিধারা। প্রথমেই বলতে হয় অব্যবহিত পূর্বে উল্লিখিত গানটির কথা

ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে শুধায়, 'সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
ওগো কও ফুটল কত ।'
তারা কয়, 'হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি
মধুরের সুদূর হাসি হায়।
খ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত ।'
তারা কয়, 'আজ কি তবে এসেছে সে নবীন বেশে ।
আজ কি তবে এত ক্ষণে জাগল বনে যে গান ছিল মনে মনে।
সেই বারতা কানে নিয়ে
যাই যাই চলে এই বারের মতো।[৮]

গানটির সমগ্র দৃশ্যপট জুড়ে শুকনো পাতা আছে বলে পুরো গানটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই গানের শুরু বিদায়ী পত্ররাজির বিলাপে কিন্তু শেষে তারা পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আবির্ভাবের সেই অমোঘ বিশ্ববিধানকে মেনে নিয়েই বিদায় গ্রহণ করে। লক্ষণীয় শুকনো পাতা এই গানটির সবটুকু জুড়ে থাকলেও, তাকে ঘিরে কবির আত্মগত অনুভূতির সামান্যতম প্রকাশ কোথাও ঘটে নি।

সেই শাশ্বত জাগতিক বিধানকেই তুলে ধরা হয়েছে পরবর্তী গানটিতেও :

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে
তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন-বায়ে
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ।।[৯]

আমাদের আলোচ্য গানে ফিরে আসা যাক। গানের সর্বত্র জুড়েই ধ্বনিত হয়েছে বিদায়ের সুর। শব্দচয়নের মধ্যে একটা অন্তর্লীন ঐক্য ধরা পড়ে। পাতাকে বিশেষিত করতে যে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, এই গানের সেই প্রথম শব্দটির মধ্যেই বিদায়-অনুভূতির ব্যঞ্জনা রয়েছে। এই শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়েছে চতুর্থ কলিতে। তার আগে তৃতীয় কলিতে সুস্পষ্টভাবে সেই ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে "বিদায়" শব্দটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে (বিদায়মন্ত্র)। এর সঙ্গে যুক্ত হয় "শেষ" শব্দের পুনরাবৃত্তি --- পঞ্চম কলিতে "শেষের বেশে" এবং একাদশ তথা শেষ কলিতে "শেষের সম্বলে" শব্দবন্ধে। সবশেষে উল্লেখ্য "ঝরা পাতা"র মত "অস্তরবি"ও একই অনুভূতির সঞ্চার করে।

এবার আমরা এই বিদায় অনুভূতি বিশ্লেষণ করব। এই গানে কোথাও ঝরা পাতা আগামী দিনে নূতন পাতার বিকাশের বার্তা বহন করে আনে না। কবির দৃষ্টিসম্পাত শুধু অতীত ও বর্তমান বাস্তবতার উপর। সেই পরিমণ্ডলের মধ্যেই ঝরা পাতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তার প্রতিফলন ক্রিয়াপদের কালরূপের ব্যবহারে। প্রথমে একটি ক্রিয়াবিহীন বাক্য, তারপর সঞ্চারী পর্যন্ত প্রথমে সাধারণ অতীত (দিল), তারপর পুরাঘটিত বর্তমান (সেজেছ) শেষে আবার সাধারণ অতীত (খেলিলে) । দেখা যাচ্ছে দুটি ক্ষেত্রে ক্রিয়ার অবস্থান নিকট অতীতে (ফাগুনের মন্ত্রদান, ঝরাপাতার হোলিখেলা) আর একটি ক্ষেত্রে ক্রিয়ার অবস্থান অতীতে হলেও বর্তমানে তার রেশটুকু রয়েছে (ঝরা পাতার সাজ)। সঞ্চারী পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কবির দৃষ্টি বর্তমানের সীমানা

অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হয় নি। আভোগে উপস্থিত দুটি ক্রিয়ারই অনুজ্ঞারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আভোগে ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। আপাতত প্রাথমিক পাঠে দেখা যাচ্ছে গানের শেষাংশে ঘটনাপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেছে, আছে শুধুই প্রার্থনা।বিদায়লগ্নে যেমন অনাগত দিনের স্বপ্ন নেই, তেমনিভাবে বর্তমান বাস্তবে জীর্ণ পাতাকে ঘিরে প্রত্যাশামত উচ্ছ্বসিত হাহাকার অথবা অবরুদ্ধ বেদনা ধ্বনিত হয় নি। "আমি তোমারি দলে" --- গানের সূচনাতে এই অশ্রুতপূর্ব ঘোষণা কবিহৃদয়ের সঙ্গে ঝরা পাতার নিবিড় একাত্মতাবোধের বহিঃপ্রকাশ। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর একটি গানেও মেলে না।

এরপরই দ্বিতীয় কলিতে আসে "অশ্রুজল", কিন্তু এই অশ্রুধারা বিদায়ী ঝরাপাতার জন্য বিলাপ নয়। অশ্রুধারার বিপরীতে আছে "হাসি"। হাসিকান্নার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ফুটে ওঠে বিশেষণের বিশেষণের পুনরাবৃত্তিতে : অনেক হাসি ... অনেক অশ্রুজলে। এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ "বিদায়মন্ত্র" শব্দবন্ধটি। বসন্তশোভা শুধু মুগ্ধ ইন্দ্রিয়চেতনায় মায়াজাল রচনা করে না, বসন্তদিনে ফোটা ফুল আর ঝরাপাতার সহাবস্থান এক গভীর জীবনবোধে কবিচিত্তকে ঋদ্ধ করে তোলে। ভাবনার এমন স্তরে উত্তরণ ঘটায় যেখানে হাসিকান্না, আনন্দবেদনার মধ্যে সব বিভাজনরেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়, ঘুচে যায় উচ্চ-নীচ আকাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিতের সমস্ত শ্রেণিবিন্যাস। বিপ্রতীপের প্রতি এই সমদর্শিতা জীবনের প্রতি দার্শনিক নিস্পৃহতা নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গী জীবনকে তার অন্তহীন বৈচিত্র্যের পূর্ণতায় উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। এমনি করে ফাগুনের বিদায়ক্ষণে তার বিদায়বার্তা হয়ে যায় "বিদায়মন্ত্র"।

ফাগুনের এই মন্ত্রদান কবির "হিয়াতলে"। সেই মায়ামন্ত্রে উজ্জীবিত কবিহৃদয়ের ভূমিকাই এই গানে প্রধান। বসন্তের বহু গানেই আমরা দেখি রূপকল্পগুলি ইন্দ্রিয়চেতনাগ্রাহ্য বাস্তবের প্রতিবিম্ব। কিন্তু কিছু গানে দেখা যায় সৃজনপ্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়চেতনার ভূমিকা গৌণ বা নগন্য ; মনই সেখানে মুখ্য ভূমিকা নেয়। সৃষ্টির কোন কোন মুহূর্তে দেখা যায় কবি শুধুমাত্র "একটুকু ছোঁওয়া" আর "একটুকু কথা" দিয়ে "মনে মনে" রচনা করেন আপন "ফাল্গুনী"। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য আর একটি গান যেখানে ইন্দ্রিয়চেতনায় উন্মোচিত বসন্তের বিপুল সৌন্দর্যসম্ভার কবিহৃদয়কে সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে না, বরং সৃষ্টির উপকরণের বাহুল্য তাঁকে ভারাক্রান্ত করে, দেখা যায় সমস্ত হৃদয় উজাড় করে আপন নান্দনিক নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্য কবি একটি নিভৃত পরিসরের ব্যাকুল অন্বেষণে নিরত :

কোনখানে আজ পাই
এমন মনের মত ঠাঁই
যেথা ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন।।[১০]

আমাদের আলোচ্য গানেও কবি "মনে মনে" রচনা করেন আপন ফাল্গুনী আর তাঁর "সকল মন" দিয়ে ফাগুন ভরে দেন। ফাগুনশোভার প্রতিভূ হয়ে আসে ঝরা পাতা। নবলব্ধ মায়ামন্ত্রবলে উন্মোচিত হয় সেই জীর্ণ পাতার স্বরূপ। ঠিক পরবর্তী অংশে মুমূর্ষু ঝরা পাতার পাণ্ডুর বিবর্ণতার মধ্যে কবি খুঁজে পান বর্ণের অনুপম বিস্তার। প্রথমে কবি তাকে দেখেন বসন্তী রঙের সাজে। তারপর আসে হোলি --- এখানে পৃথক পৃথক রঙের চিত্রায়ণ না থাকলেও এ তো রঙের উৎসব। কোন রঙই পৃথকভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয় নি, কিন্তু একটি শব্দ "হোলি"র মধ্য দিয়ে রঙের ভুবন তার পূর্ণতায় আভাসিত হয়েছে। এরপর তিনি ঝরা পাতাকে উজ্জ্বল রঙে সজ্জিত দেখেন --- আগুন রঙের উত্তরীয় তার পরিধানে।

এই বর্ণের স্তরবিন্যাস পর্যালোচনাযোগ্য। প্রথমে বসন্তের অনুষঙ্গবাহী "বসন্তী" বর্ণের সাজে সুসজ্জিত ঝরা পাতার আবির্ভাব। এই সাজসজ্জা মনে করিয়ে দেয় বিচিত্র পর্যায়ের ৩২১ নং এই গানটির শেষাংশ :

সাজে সাজে রম্যবেশে সাজে---

নীল অম্বর সাজে, ঊষাসন্ধ্যা সাজে
ধরণীধূলি সাজে, দীনদুঃখী সাজে, [১১]

ধরণীধূলির উপস্থিতি এই গানের বর্তমান আলোচ্য অংশের পরে, কিন্তু এই অংশেই আমরা দেখি দীনদুঃখীর রম্যবেশ ধারণ ; বসন্তের ভুবনে ঝরাপাতার স্থান "সবার নীচে সবার পিছে"। বিদায়মন্ত্রের উচ্চারণে যার সূচনা হয়েছে, সেই বিদায়- মহোৎসবে যোগদান করতেই ঝরা পাতার এই সাজসজ্জা। শেষের বেশ--- এই বিদায়ের সাজ কবিমনে এক বিস্ময়বিমুগ্ধ আবেশের সঞ্চার করে। সেই বর্ণনায় বাহুল্য নেই ; সেই অনুভূতির প্রকাশ শুধুমাত্র বিস্ময়দ্যোতক "কি এ" শব্দবন্ধে।

এরপর আসে ঝরা পাতার হোলিখেলা। গীতবিতানে "হোলি" শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র এই একবার। "দোল" শব্দের ব্যবহারে দ্ব্যর্থবোধকতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে –-- রঙের উৎসব অর্থে যেমন এর ব্যবহার, তেমনি "দোলা" অর্থেও এর প্রয়োগ ঘটে। এমন দ্ব্যর্থবোধকতার উদাহরণ এই গানটিতে

ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরাণ মম জাগে।
.....
দোলের নাচে বুঝি গো আছ অমরাবতীপুরে---
.....
লাগিল **দোল** জলে স্থলে, জাগিল **দোল** বনে বনে---
সোহাগিনির হৃদয়তলে বিরহিণীর মনে মনে।[১২]

এখানে পূর্বোক্ত দুই অর্থেই "দোল" শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিবর্ণ ঝরাপাতা সংশয়াতীতভাবে রঙের উৎসবেই সামিল হয়েছে। সেই বর্ণচ্ছটা ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতে অদৃশ্য থেকে যায়; সেই বর্ণবিন্যাস প্রতিভাত হয় শুধু কবির মানসনেত্রে। বর্ণমদির এই কল্পমহোৎসবে ঝরা পাতার সঙ্গে যোগদান করে ধূলা, তৃণদল --- যদিও এখানে ঝরা পাতার ভূমিকাই প্রধান। "খেলিলে" ক্রিয়াপদের কর্তা এই ঝরা পাতা ; "ধূলি" "ঘাস" ক্রিয়ার আধার। উৎসবে যোগদানকারীদের মধ্যে যোগসূত্রটি সুস্পষ্ট। এদের সঙ্গে বিজড়িত অনাদর, অবহেলার অনুষঙ্গ, এদের স্থান চরণতলে। ঝরা পাতার সঙ্গে একটি উজ্জ্বল অতীত জড়িত, কিন্তু ঘাস ও ধূলি ঘিরে জড়িয়ে আছে শুধুই উপেক্ষা, শুধুই অবহেলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা সুদূরতম নীহারিকা থেকে বিশ্বচরাচরের প্রতিটি অণু পরমাণু পর্যন্ত প্রসারিত। তাই কাব্যে সাহিত্যে যাদের অবস্থান নিতান্ত প্রান্তিক, তাদেরও কবি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন; অতিতুচ্ছ তাদের মধ্যেও তিনি সৌন্দর্যসৃষ্টির উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত গানটিতে আমরা দেখেছি নীল অম্বর, ঊষাসন্ধ্যার মত ধূলিকণাও রম্যবেশ ধারণ করে। বসন্তের গানে দেখা যায় বসন্তবায় শুধু বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে গীতলেখা লিখে যায় না, ধূলিকণার মধ্যেও কবি খুঁজে পান বসন্তের গীতলেখা

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধুলির ' পরে কী আদরে
তাই সে ধুলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে [১৩]

একইভাবে বর্ষার একটি গানে আমরা দেখি তৃণদলের এক মহিমান্বিত রূপ। এই গানে দৃশ্যপটের সবটুকু জুড়ে আছে তৃণদল। নিষ্প্রাণ মরুময়তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা বিজয়ী বীর সৈনিক ; আবার তাদের সঙ্গে কবি যুগযুগান্তব্যাপী প্রাণের বন্ধন অনুভব করেন;

ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা --- [১৪]

পদতলে দলিত হওয়ার জন্যই বিশ্বসংসারে যাদের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথ তাদেরও পরম নান্দনিক গৌরবে বিভূষিত করেন। ইনি সেই মরমী কবি যার দৃষ্টিতে গাঁয়ের উপেক্ষিতা কালো মেয়েটি কৃষ্ণকলি। ইনি সেই

মরমী কবি যার কাননের প্রাচীরগাত্রে ফুটে ওঠা, সকলের দ্বারা ধিক্কৃত নামগোত্রহীন এক ফুলকে প্রভাতসূর্য পরম মমতায় জিজ্ঞাসা করে "ভালো আছ ভাই"। [১৫]

জীর্ণ পাতা, ধূলিকণা, তৃণদল ---বিশ্বসংসারে ব্রাত্য এই ত্রয়ীর হোলি উৎসব কোন নির্দিষ্ট তিথি মেনে আসে না। এমনকি কবির ভাবনাবিশ্বেও এই উৎসব বহির্জগৎসংসারের হোলি উৎসবের মত বার বার ফিরে ফিরে আসে না। কবি তাঁর সৃষ্টির কোন বিরল মুহূর্তে ইন্দ্রিয়চেতনাবলয় থেকে বহুদূরে অনুষ্ঠিত এই কল্প উৎসব প্রত্যক্ষ করেন। এই উৎসবের চরিত্রটি তুলে ধরতে কবি এক বিশেষ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন : চরম ইতিহাসে। এই শব্দবন্ধের তাৎপর্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য।

প্রকৃতিপর্যায়ের গানে, ঋতুসঙ্গীতে "ইতিহাস" শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা বেমানান মনে হয়। ইতিহাসের ধারণার সঙ্গে যে তথ্যসংগ্রহ, সত্যাসত্য যাচাই, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া জড়িত তা যেন বড় গদ্যময়, বাস্তবধর্মী --- ঋতুসঙ্গীতের স্বপ্নবিলাসিতার পরিসরে যেন কিছুটা বিসদৃশ। আমাদের আলোচ্য গানটি বাদ দিলে গীতবিতানে "ইতিহাস" শব্দটি আর মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে। সেই গানটি প্রত্যাশিতভাবেই জাতীয় সংগীত পর্যায়ের একটি গান :

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি

.....

এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-**ইতিহাস**
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
তত দিন তুই কাঁদ রে।। [১৬]

স্বদেশ বা আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানেও "ইতিহাস" শব্দটির প্রয়োগ বিসদৃশ হত না। প্রত্যাশিতভাবে প্রকৃতি পর্যায়ের আর কোন গানে এই শব্দের প্রয়োগ ঘটে নি। এইক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিশেষণের প্রয়োগ। ইতিহাসকে বিশেষিত করতে ব্যবহৃত "প্রাচীন" "আধুনিক" ইত্যাদি যে সমস্ত বিশেষণের সঙ্গে আমরা পরিচিত, "চরম" বিশেষণটি তাদের মধ্যে পড়ে না। বাস্তবিক এমন শব্দবন্ধ বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযুক্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এমন অপ্রত্যাশিত বিশেষণের ব্যবহারে "ইতিহাস" এক ভিন্নতর মাত্রা পায়। এতে ইতিহাসের গদ্যময়, বাস্তবধর্মী রূপটি যেন লুপ্ত হয়ে যায়। বিরল এই শব্দবন্ধ ওই হোলিখেলার অদৃষ্টপূর্ব চরিত্রটি তুলে ধরে।বর্ণের উৎসবের সমাপ্তিপর্বে আসে উজ্জ্বল রং --- আগুন রঙ। এখানে শুধুমাত্র রঙের ভিন্নতা নয়, কবিপ্রাণের সঙ্গে ঝরা পাতার সম্বন্ধের অন্য একটি দিক ধরা পড়ে। সেই প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী এই অংশে আসব। বর্ণবিন্যাসের এই আলোচনা আমরা এখানে শেষ করব পূর্বোক্ত প্রকৃতি পর্যায়ের ২৬৭ নং গানটির পুনরুল্লেখ করে। উক্ত গানটিতে আমরা দেখি বসন্তের অত্যুজ্জ্বল বর্ণবিচ্ছুরণ কবিকে, ক্লান্ত করে, পীড়িত করে, তাঁর সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করে দেয় :

সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে,
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ [১৭]

প্রবল অধৈর্যে তিনি ঘোষণা করেন :

আমি চাই নে চাই নে চাই নে এমন
গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন। [১৮]

অথচ আমাদের আলোচ্য গানে দেখি তিনি বর্ণবৈচিত্র্যের সন্ধানে নিরত; স্বপ্নাবেশবিভোর দৃষ্টিতে তিনি ঝরা পাতার প্রাণহীন বিবর্ণতার মধ্যে বর্ণবিস্তার প্রত্যক্ষ করেন। কোন কোন মুহূর্তে বহিরঙ্গ শোভা তাঁর সৌন্দর্যচেতনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না ; ইন্দ্রিয়চেতনার অন্তরালস্থিত সৌন্দর্যসুধা আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে প্রাণ। তখন অসুন্দরের মধ্যেই তিনি সুন্দরের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হন। এই গানে তাঁর সেই প্রয়াস বিবর্ণ ঝরা পাতাকে ঘিরে। আভোগ অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করি ঝরা পাতা তথা কবির ভিন্নতর ভূমিকা।

আমরা উল্লেখ করেছি এই তুকের দুটি ক্রিয়ারই অনুজ্ঞারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। ঝরা পাতার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রথম ক্রিয়াটির রূপ মধ্যমপুরুষের। অর্থাৎ কবি প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেন ঝরা পাতার উদ্দেশে। কবি এখন শুধুই প্রার্থী। দীনহীন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ এই ঝরাপাতা --- যে বড়জোর অনুকম্পার উদ্রেক করতে পারে ---এখানে আমরা তাকেই দেখি কবির প্রার্থনাপূরণকারীর ভূমিকায়। পূর্ববর্তী অংশে প্রথম কলির পর থেকে কবি শুধু দ্রষ্টা --- অন্তরাল থেকে তিনি ঝরা পাতার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করেন : তার সাজ, তার হোলিখেলা। কিন্তু এবার তিনি তার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে নিতে চান। ঝরা পাতার পরিধানে যে কল্প উত্তরীয় তাঁর স্বপ্নাবেশবিভোর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তারই অগ্নিবর্ণে তিনি আপন উত্তরীয় রঞ্জিত করে নিতে চান। ঝরা পাতার সঙ্গে যে একাত্মতাবোধের অভিব্যক্তি গানের সূচনাতে, ঝরা পাতাকে অনুকরণের এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই অনুভূতি নিবিড়তর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রাথমিক পর্যালোচনাতেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম, প্রথম কলিতে যেমন উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সহাবস্থান (আমি, তোমারি) তারপর সেই সহাবস্থান আবার আভোগের প্রথম কলিতে (তোমারি, আমারো)। এখানে উত্তরীয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণযোগ্য। পূর্ববর্তী অংশের উৎসবের আবহের পর এবার কবির ঝরা পাতার অনুসরণে উত্তরীয় ধারণের মধ্য দিয়ে যেন যেতে পারে এক দীক্ষা-অনুষ্ঠানের আবহ গড়ে ওঠে। একই রঙে উত্তরীয় রঞ্জিত করার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা : কবি ও ঝরা পাতা যেন একই মন্ত্রে দীক্ষিত। অথবা আর একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে ঝরা পাতা স্বয়ং কবির দীক্ষাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আভোগের প্রাথমিক পাঠ অনুসারে দুটি পৃথক প্রার্থনাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে --- প্রথমটি ঝরা পাতার উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়টি অস্তরবির উদ্দেশ্যে। "ঝরা পাতা" ও "অস্তরবি" দুটি বাক্যের কর্তা। বাক্যযুগলের দ্বিতীয় পার্থক্য ক্রিয়ারূপে --- দুটি ক্ষেত্রে অনুজ্ঞার ব্যবহার হলেও প্রথম ক্ষেত্রে মধ্যমপুরুষের রূপ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথমপুরুষের রূপ ব্যবহৃত। ক্রিয়ারূপ নিয়ে ভিন্নতর পাঠ সম্ভব নয়। তবে ক্রিয়ার কর্তার ক্ষেত্রে ভিন্নতর ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে কবি যে আগুন রঙ বিদায়ী ঝরা পাতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন তা যেন সন্ধ্যারবির শেষ কিরণ হয়ে দেখা দেয়। জীবন সায়াহ্নে ঝরা পাতা অস্তাচলগামী জীবনরবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এই পাঠ অনুসারে দুটি প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে শুধু ঝরা পাতারই উদ্দেশ্যে --- প্রথমে তার বাস্তব রূপের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার প্রতীকের উদ্দেশ্যে। কবির প্রার্থনা ঝরা পাতার মোহিনী মায়া বিস্তার লাভ করুক তাঁর অন্তর বাহির, দেহ মন, সর্বত্র জুড়ে--- তাঁর উত্তরীয়ের বর্ণে, তাঁর প্রাণের গভীরে।

গানের শেষাংশে "আগুন" "পরশমণি" "প্রাণ" এই বিশেষ্যত্রয়ী এবং স্পর্শদ্যোতক "লাগাক" ক্রিয়াপদের উপস্থিতি অবধারিতভাবে সেই গানটিকেই মনে করিয়ে দেবে : আগুনের পরশমণি ছোঁওয়াও প্রাণে। কিন্তু এই গানটির সঙ্গে আমাদের আলোচ্য গানের পার্থক্য এই যে এখানে এই প্রার্থনা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় নি, এই প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে দীনহীন ঝরা পাতার উদ্দেশ্যে।

এই পরশমণির পরশের তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য। এখানে পূর্বোক্ত গানটির মত দুঃখের দহনে চিত্তশুদ্ধির ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। "এ জীবন পুণ্য কর দহনদানে" --- এমন প্রার্থনা এই গানে উচ্চারিত হয় নি। "প্রাণে" নয়, "প্রাণের শেষ সম্বলে" আকাঙ্ক্ষিত এই পরশমণির স্পর্শ। ঝরা পাতার কাছ থেকে লব্ধ দীক্ষামন্ত্র পরশমণির মত কবির জীবনের শেষ সঞ্চয়টুকুকে অমূল্য সম্পদে রূপান্তরিত করে। বিদায়লগ্নে জীবনের সমস্ত না পাওয়ার বেদনা, হাহাকারকে ছাপিয়ে যায় পরম প্রাপ্তির পূর্ণ আনন্দ।

ঝরাপাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভাবনা সম্বন্ধে রানী চন্দের একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ দিয়ে আমরা এই নিবন্ধটি সমাপ্ত করব।

> বাগানে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা তিনি পছন্দ করেন না , বলেন :
>
> ঝরাপাতা বাগান ও গাছের একটি অঙ্গ। আশ্চর্য হই যখন লোকে তা পছন্দ করে না, শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে বাগান পরিষ্কার রাখে। শুকনো পাতারও যে একটা ভাষা আছে । [১৩]

আমাদের আলোচ্য গানে রবীন্দ্রনাথ সেই অব্যক্ত নীরব ভাষাকেই রূপ দিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৫৩৯ -৫৪০

২) গানগুলির পর্যায় ও সংখ্যা : পূজা (৪১, ৩৮৭) প্রেম (৩০৮) প্রকৃতি (৫৯, ১৯৬, ২০৩, ২২৪, ২৩৫,২৬৪), বিচিত্র (২৪)

৩) গানগুলির পর্যায় ও সংখ্যা : প্রেম (১৮, ১৬৯), প্রেম ও প্রকৃতি (৬৬), বিচিত্র (২৮)

৪) গানগুলির পর্যায় ও সংখ্যা : পূজা (২৫৮), প্রেম (১৭৩), প্রকৃতি (১০, ১৮০, ২৩০,২৫৩)

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৫১৬

৬) তদেব, পৃ ৫২৭

৭) তদেব, পৃ ৩৩৯

৮) তদেব, পৃ ৫৩১ - ৫৩২

৯) তদেব, পৃ ৫৫৫

১০) তদেব, পৃ ৫৩৩

১১) তদেব, পৃ ১৩৫

১২) তদেব, পৃ ৩৫৮-৩৫৯

১৩) তদেব, পৃ ৫৩১

১৪) তদেব, পৃ ৪৫৩

১৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : উদারচরিতানাম্, কণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ২০১৩,পৃ ৬০

১৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৮১৫

১৭) তদেব, পৃ ৫৩৩

১৮) তদেব

১৯) চন্দ, রানী : আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩

দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বিশ্বাস, অপূর্ব : ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬

রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১

রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০

সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি ,গানের ঝরনাতলায়, কলকাতা,প্রতিভাস ,২০১৩

সর্বাধিকারী, কেতকী : রবির আলোয় ঋতুদের শোভাযাত্রা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৪

সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২